নিজেকে জানো

নতুন বোধ নতুন অনুভূতি

কিশোর-কিশোরীদের জন্য

(১০-১৪ বছর বয়সী)

তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

ভূমিকা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

পারিবারিক সম্পর্ক

বাইরের পরিবেশ

আকর্ষণ

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা

অনুভূতি প্রকাশ

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

তথ্য ও সেবা পাওয়ার স্থান

'নিজেকে জানো' সিরিজের 'নতুন বোধ, নতুন অনুভূতি' নামের সুদৃশ্য বইটি কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তৈরি ৪টি বুকলেটের মধ্যে অন্যতম। বইটি রচনায় অনেক ব্যক্তি ও সংস্থা অবদান রেখেছেন। আইসিডিডিআরবি'র ফ্যামিলি হেলথ্ রিসার্চ প্রজেক্ট কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বইগুলোর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২ ও ২০০৫ সালে তৈরি ও প্রকাশিত হয়। ২০১৩ সালে আইসিডিডিআরবি'র ট্র্যাকশন (TRAction) প্রজেক্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডাটা ব্যাংক প্রশ্নসম্ভার থেকে তথ্য নিয়ে বর্তমানে বইগুলোর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই সিরিজের অন্যান্য প্রকাশিত বইগুলো হচ্ছে 'বয়ঃসন্ধিকাল', 'যৌনরোগ ও এইচআইভি-এইডস' ও 'বিয়ে এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য'। ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় এআরএইচ ওয়ার্কিং গ্রুপের নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস বইটি প্রণয়ন করেছে:

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
- আইসিডিডিআর'বি
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (বিএসএমএমইউ)
- ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ্ নিউট্রিশন (আইপিএইচএন)
- আন্ডার প্রিভিলেজড্ চিলড্রেন'স এডুকেশন প্রোগ্রামস্ (ইউসিইপি)
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)
- ইউনাইটেড নেশনস্ পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)
- ইউনাইটেড নেশনস্ চিলড্রেন'স ফান্ড (ইউনিসেফ)
- ইউনাইটেড স্টেট্স্ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)
- ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এফপিএবি)
- পপুলেশন কাউন্সিল
- সেইভ দ্যা চিলড্রেন
- সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি)
- প্ল্যান বাংলাদেশ
- মেরী স্টোপস্ বাংলাদেশ
- স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (সান)
- এমিনেন্স
- কনসার্নড্ উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভলপমেন্ট (সিডব্লিউএফডি)
- ব্র্যাক
- বাংলাদেশ নলেজ ম্যানেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (বিকেএমআই)
- বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ (বিসিসিপি)
- এনজিও হেলথ্ সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (এনএইচএসডিপি)
- বাংলাদেশ উইমেনস হেলথ্ কোয়ালিশন (বিডব্লিএইচসি)
- এফএইচআই ৩৬০

বইটি রচনা ও প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি এটি পর্যালোচনা করেছেন।

এই বইটি রচনা, প্রণয়ন ও পর্যালোচনায় যারা মূল্যবান অবদান রেখেছেন, তাদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

ভূমিকা

বয়স বাড়ার সাথে সাথে তোমাদের শরীর ও মনের পরিবর্তন হয়। তোমাদের শরীরের গড়ন তখন পর্যায়ক্রমে প্রাপ্তবয়স্কদের মতোই হয়ে যায়। অপরের সাথে তোমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। মা-বাবা ও পরিবারের শাসন থেকে তোমরা নিজেদের আরো মুক্ত মনে করতে পারো। নিজেদের ব্যাপারে তোমরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চাও। কি পছন্দ করো আর করো না এ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা জন্মায়। তোমাদের বয়সি ছেলে বা মেয়েদের সাথে তোমরা গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাও। এ সময় তোমরা ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও নিতে পারো, আবার কেউ কেউ বিয়ের কথাও ভাবতে শুরু করো।

এ বয়সে তোমরা নিজেকে একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বা নারী ভাবতে ভালোবাসো এবং অধিকতর স্বাধীনভাবে কিছু একটা করতে ও ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো। যেহেতু এ সময়ে মা-বাবারা তোমাদের এখনও ছোট মনে করেন, তাই তারা স্বাভাবিকভাবেই মনে করতে পারেন যে তোমরা অনেক কিছুই বুঝতে পারো না। তাই তোমাদের নিরাপত্তা ও সুনাম নিয়ে মা-বাবারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাদের চিন্তা তোমরা হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আর এ কারণে বয়স বাড়ার সাথে সম্পর্কিত অনেক জরুরি ব্যাপার তোমাদের সাথে আলাপ করতে তাদের অসুবিধা হতে পারে।

তোমাদের মা-বাবাদের অনেকেই তোমাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন বিষয়ে তোমাদের সাথে আলাপ করতে চান, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চান। কিন্তু এসব বিষয় আলোচনা করতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। এমনকি তোমরাও এসব আলোচনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো না। এ কারণে তোমাদের অনেকেই অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য জানার চেষ্টা করো, যেমন বন্ধু-বান্ধব, বিভিন্ন ধরনের বইপত্র, ম্যাগাজিন, ভিডিও, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। কিন্তু এসব সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য কখনো কখনো সঠিক নাও হতে পারে। সুতরাং এসব ব্যাপারে জানতে চাইলে সবসময় মা-বাবা বা অন্য কেউ, যে এ সম্পর্কে ভালো জানে তার সাথে আলোচনা করাই শ্রেয়।

এই বয়সে জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য তোমরা জানতে চাও বা তোমাদের জানা প্রয়োজন, অথচ এসব বিষয়ে সঠিক তথ্য সাধারণত পাওয়া যায় না, আর মা-বাবার সাথে এসব বিষয়ে আলোচনা করাটাও বেশিরভাগ সময় সহজ নয়। তাই আমরা আশা করছি, এই বইটি তোমাদের অনেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে এবং তোমাদের অনেক বিষয় জানতে সাহায্য করবে যাতে তোমরা জীবনের বিভিন্ন পদক্ষেপে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারো।

তোমাদের মতো কিশোর-কিশোরীরা যাদের মনে বিভিন্ন বিষয়ে হাজারো প্রশ্ন জমা হয়ে আছে তাদের জন্যই এ বইটি লেখা হয়েছে। আমরা তোমাদের প্রশ্নগুলো জানতে বিভিন্ন সময় গবেষণা করেছি। এ বইয়ের প্রশ্নগুলোও তোমাদের মতো ছেলে-মেয়েরা কিছুদিন আগে করা গবেষণায় আমাদের জিজ্ঞাসা করেছে। ঐ প্রশ্নগুলো এবং তাদের উত্তর নিয়েই এই বইটির তৃতীয় সংস্করণ সাজানো হয়েছে। এ বইটি ছাড়াও এ রকম আরো তিনটি বই আছে। এই বইগুলো তোমাদের মতো কিশোর-কিশোরীদের কৌতূহল মেটাবে বলে আশা করি।
বইগুলো হলো-

- বয়ঃসন্ধিকাল
- যৌনরোগ ও এইচআইভি-এইডস
- বিয়ে ও পারিবারিক স্বাস্থ্য

এই বইগুলো পড়ে তোমরা যেনো সহজেই এ বয়সের বিভিন্ন পরিবর্তন, সমস্যা ও তার সমাধান বুঝতে পারো এবং সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারো সেটাই আমাদের কাম্য।

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

সাধারণত তোমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদের নিজেদের শরীর সম্পর্কে কৌতূহল থাকে। নিজের শরীর সম্পর্কে জানতে চাওয়া ভালো এবং এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। বয়ঃসন্ধিকালে তোমাদের শরীরে ও মনে স্বাভাবিকভাবেই অনেক পরিবর্তন আসে। কারো এ পরিবর্তন আগে শুরু হয় আবার কারো বা পরে। বয়ঃসন্ধিকালে তোমাদের মতো ছেলেমেয়েদের শরীরের এসব পরিবর্তন হরমোনের কারণে হয়ে থাকে। হরমোন হচ্ছে শরীরের ভেতরে তৈরি এক ধরনের গ্রন্থিরস যা দেহকে সক্রিয় রাখে এবং দেহের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে সহায়তা করে। বেড়ে ওঠার এ ব্যাপারটা অনেকটাই বংশগত। তবে এখানে সঠিক পুষ্টিরও বেশ প্রভাব রয়েছে।

যখন একটি মেয়ে ১০-১২ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন তার শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয়। যেমন- উচ্চতা বাড়ে, মাসিক শুরু হয়, স্তন বড় হয়, বগলে ও যৌনাঙ্গে লোম গজায়। এই পরিবর্তনগুলোই হচ্ছে মেয়েদের বড় হওয়ার লক্ষণ। মাসিক একটি মেয়ের শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা সাধারণত ১০-১৩ বছর বয়সে শুরু হয় এবং স্বাভাবিক নিয়মে ৪৫-৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত চলে। মাসিক স্রাব শুরু হওয়ার প্রথম বছরগুলোতে কিছুটা অনিয়ম হতে পারে এবং তলপেটে ব্যথা হতে পারে। যদিও এ বয়স থেকেই মেয়েরা গর্ভবতী হতে পারে, তবুও ২০ বছর বয়সের আগে শরীরের বৃদ্ধি পুরোপুরি না হওয়ার কারণে তাদের সন্তান ধারণ করা উচিত নয়।

মেয়েদের মতো ছেলেরা যখন বড় হতে থাকে, তখন তাদেরও বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন- উচ্চতা বাড়তে থাকে, কাঁধ চওড়া হয় এবং শরীরের মাংসপেশি সুঠাম ও সবল হতে থাকে।

ছেলেরা যে বড় হচ্ছে তার আরও লক্ষণ হলো দাড়ি-গোঁফ গজানো ও গলার স্বরের পরিবর্তন। এ বয়সে ছেলেদের মূত্রনালী দিয়ে শুক্রাণুযুক্ত রস মাঝে মধ্যে বের হয়ে আসে, কখনো কখনো ঘুমন্ত অবস্থায়ও এ রস বের হতে পারে যাকে 'স্বপ্নদোষ' বলা হয়। এই শুক্রাণুই সন্তান জন্মদানের বীজ। স্বপ্নদোষ আসলে দোষের কিছু নয় বরং এটা ছেলেদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও প্রজনন ক্ষমতা বা সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা অর্জনের লক্ষণ।

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বেশ কিছু মানসিক পরিবর্তনও দেখা দেয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নিজেদের বড় ভাবতে শুরু করা, ছেলেমেয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণবোধ, অজানা জিনিস জানার কৌতূহল, চেহারা ও পোশাক সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং আরো অনেক কিছু। তোমাদের কারো কারো এ সময় স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা হয়, স্বাবলম্বী হতেও ইচ্ছা করে। এ সময় খুব অল্পতেই মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে, আবার কখনো মন খুশিতে ভরে যায়। কেউ কেউ একা থাকতে পছন্দ করতে পারো, আবার কেউ বেশ মিশুক হতে পারো। মনে রেখো এই পরিবর্তনগুলো সাময়িক। বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে এসব ব্যাপার স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

কৈশোর কৌতূহলের বয়স। এ সময় তোমাদের নিজেদের শরীর, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক বিষয়ে জানতে ইচ্ছা করতে পারে। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় এ বয়সে তোমরা নানারকম দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও আবেগের ফলে অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে থাকো। তাই মা-বাবা ও অন্যান্য অভিভাবকদের পরামর্শ নেয়া এ সময় তোমাদের জন্য খুব প্রয়োজন। তারা তোমাদের সবচেয়ে আপনজন ও সবসময় তোমাদের ভালো চান। সাধারণত তারাই তোমাদের সবচাইতে ভালোভাবে বুঝতে পারেন। যেকোনো সমস্যা হলে তাই তাদের কাছে তোমরা সহজেই সমাধান পাবে।

পারিবারিক সম্পর্ক

যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন সে শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অসহায় থাকে। মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্যের আদর-যত্ন ও ভালোবাসায় সে আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে। তোমাদের মতো আমরা সবাই পরিবারের মধ্যে থেকে এভাবেই বড় হয়েছি। পরিবারের সবার মধ্যে এ সম্পর্ক ও বন্ধন সাধারণত খুবই আন্তরিক ও মধুর হয়ে থাকে।

ছেলেমেয়েরা যখন বড় হতে শুরু করে তখন মা-বাবারা তাদের প্রতি আরো বেশি মনোযোগী ও যত্নশীল হন। কারণ, এ বয়সটাই ভবিষ্যত গড়ার সময়। তোমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা মনে রেখেই তোমাদের ভালোর জন্য তারা মাঝে মাঝে শাসন করেন। তোমরা হয়তো ভাবো, "আমরা তো এখন বড় হয়ে গেছি- সবই বুঝি, তবুও কেন মা-বাবারা এতো উপদেশ দেন"। যেহেতু মা-বাবারা তোমাদের চেয়ে অনেক বড়, তারা এ বয়স পার করে এসেছেন এবং জীবন সম্পর্কে তাদের অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই, তোমাদের উচিত তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং মেনে চলা।

একটি পরিবারে মা-বাবা ও তুমি ছাড়া আরও থাকতে পারে তোমার ভাই বা বোন, চাচা-চাচী, দাদা-দাদি, দূর-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন। সবার সাথে সুন্দর ও ভালো সম্পর্ক পরিবারের সুখ ও শান্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, যা তোমাদের সারা জীবন কাজে লাগবে, একসাথে বসবাস করলে নিজেদের মাঝে অনেক সময় ভুল-বোঝাবুঝি হতেই পারে। যেকোনো সমস্যা পরিবারের সবার সাথে খোলামেলা আলোচনা করে নিলে তা সমাধান করা সাধারণত সহজ হয়।

ছেলেমেয়ে বড় হওয়া শুরু করলে কেন তারা মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য থেকে নিজেদের আলাদা মনে করে?

বড় হওয়ার সাথে সাথে শারীরিক ও মানসিকভাবে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তনের সময়ে ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে বড় ভাবতে শুরু করে এবং নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলতে চায়। বেশির ভাগ সময় দেখা যায় যে, মা-বাবারা তাদের এ চলাফেরা মেনে নিতে চান না। তাদের কাছে তোমাদের বয়সি কিশোর-কিশোরীরা এখনও ছোট। সেজন্যই এ সময়ে বড়দের সাথে একটা দূরত্ব তৈরি হতে পারে। তাছাড়া, অনেক সময় ছেলেমেয়েরা মন খুলে অন্য কারো সাথে সমস্যার কথা বলতে পারে না। এ সময়ে নিজের চিন্তা এবং সমস্যাগুলি যদি পরিবারের অন্যদের সাথে খোলাখুলিভাবে আলাপ করে নেয়া যায় এবং সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা যায় তাহলে বিভিন্ন সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়।

মা বাবারা আগে আদর করতো, সুন্দরভাবে কথা বলতো। এখন কথাবার্তার মধ্যে শাসন করে ও বাধা দেয়, কেন এটা করে?

ছেলে-মেয়েরা যখন বড় হতে শুরু করে,তখন মা-বাবারা তাদের প্রতি আরো যত্নশীল হন। কারণ, এই বয়সটা ভবিষ্যত গড়ার বয়স। দেখা যায় যে, এই বয়সে ছেলেমেয়েরা নানারকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও আবেগের ফলে অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে থাকে। তাই সন্তানের ভালোর জন্য ও নিরাপত্তার কথা ভেবে মা-বাবা এই বয়সে ছেলেমেয়েদের শাসন করেন, ঘরের বাইরে খেলতে যেতে বা একা একা বাইরে যেতে নিষেধ করেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের আচরণের প্রত্যাশিত পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখতে না পেলে বাবা মা শুধরে দিতে চান।

মা কোথাও যেতে নিষেধ করলে আমার খুব রাগ হয়, কেন মা আমাকে বুঝতে চায় না?

যখন একটি ছেলে বা মেয়ে বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায় তখন তার বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মনেরও নানা ধরনের পরিবর্তন হয় এবং আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়ের সাথে তাদের পরিচয় হয়। তাছাড়া এ সময় ছেলেমেয়েদের মনেরও পরিবর্তন হয়। তারা খুব আবেগপ্রবণ থাকে এবং নিজেদের ইচ্ছামতো চলতে চায়। তবে নতুন অনুভূতি ও আবেগের বশে ছেলেমেয়েরা এ বয়সে ভুল কাজ করতে পারে যা তাদের জীবনের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। ছেলেমেয়েরা যেন ভুল না করে সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে সে জন্য মা-বাবা ও অভিভাবকগণ বিভিন্ন রকম পরামর্শ দেন এবং শাসনও করতে পারেন। এই বয়সে আবেগের কারণেই বাবা-মা কোনো কাজ করতে নিষেধ করলে কিশোর-কিশোরীদের রাগ হতে পারে যা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। তবে নিজেদের ভালোর জন্যই এ বয়সে উপদেশ অপছন্দ হলেও তা মেনে নিয়ে যদি মা-বাবার সাথে খোলামেলা আলাপ করা হয়, তাহলে মা-বাবা ছেলেমেয়েদের বুঝতে পারেন এবং সমস্যাও অনেক কমে যায়।

বিকালে খেলতে গেলে বাবা সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসতে বলেন। আগে বলতেন না, এখন কেন বলেন?

এ বয়সটা আসলে নিজেকে ঠিকমতো গড়ে তোলার বয়স। বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো লেখাপড়ার ক্ষতি। এমনকি এর কারণে অনেক ছেলেমেয়ে বিপথেও যেতে পারে। অন্যান্য সামাজিকতা ও খেলাধুলার মাঝে লেখাপড়ার গুরুত্ব কমে যেতে পারে। জীবনে সব কিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় ও বয়স আছে। সন্ধ্যাবেলা লেখাপড়ার সময়। নিয়মমতো লেখাপড়া করা ভবিষ্যত গড়ার জন্য খুবই জরুরি। তাই সন্তানের ভালোর জন্য বাবারা এ রকম বলে থাকেন। এছাড়া নিরাপত্তার কথা ভেবেও মা-বাবা তোমাদের সন্ধ্যার আগে ফিরে আসতে বলেন।

ছেলেমেয়েদের প্রতি মা-বাবারা কি রকম আচরণ করবেন?

সাধারণত মা-বাবারা সবসময় পরামর্শ দিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের সঠিক পথে চালাবার চেষ্টা করেন। তবে তাদের আচরণ হতে হবে বন্ধুসুলভ। কিন্তু কিশোর-কিশোরীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধিনিষেধ থাকা প্রয়োজন, সেটা তাদের ভালোর জন্যই। যদি মা-বাবারা অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন এবং তাদেরকে যেখানে সেখানে যেতে দেন তাহলে ঐ ছেলেমেয়েরা অনেক সমস্যায় ও অসহায় অবস্থায় পড়তে পারে। অন্যদিকে মা-বাবারা যদি বেশি কঠোর হন তবে ছেলেমেয়েরা অস্থির হয়ে পড়বে এবং একদিন জেদি হয়েও উঠতে পারে। এমনকি জেদের বশে খারাপ কাজ বা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতেও পারে। মা-বাবা ও ছেলেমেয়েদের মাঝে তাই খোলামেলা আলাপ-আলোচনা হওয়া দরকার।

মা-বাবারা কেন মেয়েদের নিয়ে ভয় পান? ছেলেদের বাড়ি থেকে বের হতে দেয়, আমাদের দেয়না কেন?

মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে, বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে ভয় পান। পারিপার্শ্বিক কারণে মেয়ে-সন্তানদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন বলেই তাদের নিয়ে মা-বাবারা বেশি চিন্তায় থাকেন। কারণ যদি কোনো মেয়ে কোনো কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয় তবে তা তার জন্য ভবিষ্যতে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। ছেলেদের নিয়েও আমাদের সমাজ ও পরিবেশের কারণে অনেক রকম ভয় থাকতে পারে। মা-বাবারা তাদের ছেলেমেয়েদের ভালো চান এবং সাবধান থাকতে চান বলেই তাদের নিয়ে ভয় পান বা দুশ্চিন্তা করেন। সন্তানের কল্যাণ ও নিরাপত্তার কথা ভেবেই মা-বাবারা কিশোরী মেয়েদের বেশি চোখে চোখে রাখতে চান। এতে তোমাদের স্বাধীনতা নষ্ট হচ্ছে এমন ভাববার কোনো কারণ নেই।

আমার ভাইয়ের প্রতি মা-বাবার ব্যবহার কেন আলাদা? একটি মেয়ের চেয়ে ছেলেকে কেন মা-বাবা বেশি আদর করে?

কিছু কিছু পরিবারে ছেলেকে মেয়ের তুলনায় বেশি আদর ও যত্ন করা হয়, কারণ তারা মনে করেন ছেলে ভবিষ্যতে উপার্জন করে পরিবারের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দেবে আর মেয়ে যাবে অন্যের সংসারে। এ ধারণা ঠিক নয়। আজকাল মেয়েরাও ছেলেদের মতো পরিবারে সমান ভূমিকা রাখছে। সমাজেও এখন ধীরে ধীরে মেয়েদের ভূমিকা বদলে যাচ্ছে। সন্তান হিসেবে ছেলে ও মেয়ে সবারই রয়েছে সমান অধিকার।

ছেলে-মেয়ের বৈষম্য কিভাবে দূর করা যায়?

ছেলে-মেয়ের মাঝে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার জন্য বাবা-মার দায়িত্ব প্রথম থেকে ছেলে-মেয়েকে সমান চোখে দেখা। মা-বাবাকে পরিবারে এমন মানসিকতা ও পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেন ভাইবোনেরা নিজেদের সবদিক থেকে সমান বলে বিশ্বাস করতে শেখে। পরিবারে, স্কুলে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদেরও একে অপরকে সমান বলে ভাবা উচিত। পরস্পরকে সমান মর্যাদা ও সম্মান দেয়া উচিত। আমাদের দেশে ও সমাজে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে মেয়েদের লেখাপড়া, প্রতিষ্ঠা ও স্বাবলম্বী হওয়া, অধিকার আদায় ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সরকারিভাবে ও অন্যান্য সকল পর্যায়ে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আশার কথা, এতে করে বৈষম্য কমে আসছে।

কাজে কোনো ভুল করলেই মা বকাঝকা করেন কেন?

কাজ করতে গেলে মাঝে মাঝে ভুল হতেই পারে এবং সেই ভুলের জন্য মার বকা দেয়া দোষের কিছু নয়। মায়েরা সাধারণত সন্তানের ভালোর জন্যই শাসন করেন। সেটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। আসলে এ বয়সে ছেলে-মেয়েদের অল্পতেই রাগ করতে দেখা যায়। এটা কৈশোরের একটা প্রভাব। এ সময় প্রায়ই কিছু ভালো লাগে না এবং প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝি হয়। তাই অনেক সময় মায়ের উপদেশকেও বকাঝকা মনে হতে পারে।

লিঙ্গজনিত সমস্যাগুলো পিতা-মাতার সাথে খোলামেলা শেয়ার করতে পারছি না। অথচ এ বিষয়গুলো বন্ধু-বান্ধবদের সাথে শেয়ার করতে পারছি। এ পার্থক্যটা কেন?

কিশোর বয়সি ছেলে-মেয়েরা নিজেদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে কৌতূহলী থাকে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে মা-বাবার সাথে আলোচনা করাই যায়। কিন্তু আমাদের সমাজে বেশির ভাগ মা-বাবা এসব আলোচনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না বলেই ছেলেমেয়েরা এসব বিষয় বাবা-মাকে জানাতে চায় না। অন্যদিকে সমবয়সি হবার কারণে বন্ধুদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক সহজ ও খোলামেলা। একই বয়সের বলে তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের সমস্যাও একই ধরনের হতে পারে। তাই স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য বিষয়ের মতো লিঙ্গজনিত সমস্যাগুলো নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলা সহজ। তবে মনে রাখবে, তোমাদের বয়সি বন্ধুরা তোমারই মতো। তারাও এসব বিষয়ে খুব বেশি তথ্য জানে না। তারা যা জানে তা ভুলও হতে পারে। মা-বাবা যেহেতু সন্তানের অভিভাবক এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অনেক বেশি। তাই এ বিষয়গুলো নিয়ে বন্ধুদের চেয়ে বাবা-মায়ের সাথে আলোচনা করা ভালো।

বাইরের পরিবেশ

ছেলে-মেয়েরা যখন বড় হয় তখন পরিবারের গন্ডি ছাড়িয়ে তাদের প্রায়ই বের হয়ে আসতে হয়। এ সময় রাস্তা-ঘাটে, দোকানে, স্কুলে ও বন্ধুদের বাসায়ও বিভিন্ন জনের সাথে দেখা ও পরিচয় হতে পারে। এভাবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এ বয়সে যেকোনো ধরনের সম্পর্ক স্থাপনে সাবধান না থাকলে অনেক ধরনের বিপদ হতে পারে।

একটি ছেলে আমার সাথে প্রায়ই গল্প করতে চায়। আমার যেন কেমন ভয় ভয় লাগে। কেন এমন হয়?

এ বয়সে ছেলেরা মেয়েদের সাথে গল্প করতে চাইতেই পারে। একইভাবে মেয়েরাও ছেলেদের সাথে কথা বলতে চাইতে পারে। কথা বলা বা গল্প করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। এতে কারো ভালো লাগে বা আবার কারো ভয়ও লাগতে পারে। তবে সাধারণত এতে ভয়ের কিছু নেই। এ রকম হলে মা-বাবা এর পরিণাম ভেবে রাগ করতে পারেন, লোকজন খারাপ বলতে পারে, আবার কোনো কোনো সময় সংযত না থাকলে আরো কিছু ঘটতে পারে। যখন ছেলে-মেয়েদের এমন সম্পর্ক বেশি দূর গড়ায়, আর অবাধ মেলামেশার দিকে এগুতে থাকে তখন সময়মতো নিজেকে সরিয়ে নেওয়াই ভালো। মনে রাখা দরকার, কৈশোর হলো জীবন গড়ার শ্রেষ্ঠ সময়।

কোনো ছেলেকে ভালো লাগলে সেটা আম্মুকে বা আব্বুকে বললে তারা যদি মাইন্ড করে তাহলে কি করবো? বলতে পারছি না। কি করবো এখন?

বয়ঃসন্ধিকালে বিভিন্ন মানসিক অনুভূতির মতো বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এই বয়সে স্বাভাবিক নিয়মে তোমার কাউকে ভালো লাগতেই পারে। তবে এ ধরনের ভালোলাগার অনুভূতি নিয়ে তোমাদের মতো ছেলে-মেয়েদের বেশি চিন্তাভাবনা না করাই ভালো। কারণ সব ভালো লাগা তোমাদের জন্য ভালো নাও হতে পারে। ভালো লাগার এই বিষয়টিকে যদি তোমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয় বা মানসিক চাপের কারণ হয় তবে তুমি অবশ্যই তোমার মা-বাবাকে বলতে দ্বিধা করো না।

আর বাবা-মাকে বলতে না পারলে পরিবারের নির্ভরযোগ্য কোনো সদস্য যেমন- বড়বোন, ভাবি বা দাদীকে তোমার মনের অবস্থা জানাতে পারো। এতে দ্বিধা করার কিছু নেই। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, বাবা-মা সবসময় তার সন্তানের ভালো চান। সঠিকভাবে বোঝালে তারা তোমাদের অবশ্যই বুঝবেন। আর এই বিশ্বাস থেকে যেকোনো সমস্যায় সবার আগে বাবা-মা ও পরিবারের সাথে আলোচনা করাই ভালো।

ছেলেরা মেয়েদের টিটকারি দেয় কেন? এটা কি শুধুই আনন্দ না অন্য কিছু?

টিটকারি দেওয়া মোটেও ভালো কাজ নয়। অনেক সময় কিছু কিছু ছেলে বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে মেয়েদের টিটকারি দেয়। তবে টিটকারি দেয়া কোনো আনন্দের বিষয় নয়। এ ধরনের টিটকারি দেয়া মেয়েদের প্রতি ছেলেদের হেয় মনোভাবের প্রকাশ। যারা টিটকারি দেয় তাদের বোঝা দরকার যে, কাউকে বিরক্ত করা বা অপমান করা মোটেও উচিত নয়। টিটকারি দেয়ার কারণে অনেক মেয়ে মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে। টিটকারি দেয়া বা উত্ত্যক্ত করা যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে যা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

স্কুল থেকে ফেরার পথে বখাটে ছেলেরা আমাদের টিটকারি দেয়, ডিস্টার্ব করে- এ অবস্থায় আমরা কি করবো?

মেয়েদের টিটকারি দেয়া বা উত্ত্যক্ত করা এক ধরনের যৌন হয়রানি এবং আমাদের দেশে এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। রাস্তাঘাটে কেউ টিটকারি দিলে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। তবে বাড়ি ফিরে ব্যাপারটি অবশ্যই বাবা-মাকে জানানো প্রয়োজন। একা পথ চললে বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তাই স্কুল থেকে ফেরার পথে কয়েকজন মিলে একসাথে চলা ভালো। এ রকম ঘটনা ঘটলে ভয় পাবার কিছু নেই।

মেয়েদের খেপানো বা বিরক্ত করা কি অপরাধের কাজ? মেয়েরাও কি ছেলেদের খেপাতে পারে?

রাস্তায়, স্কুলের সামনে, বাসে বা অন্য কোথাও মেয়েদেরকে খেপানো বা বিরক্ত করা অপরাধ। একে ইভটিজিং বা যৌন হয়রানি বলা হয়। যৌন হয়রানি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের আচরণ মেয়েদের কখনো ভালো লাগে না, বরং এতে তারা অস্বস্তি ও অপমানিত বোধ করে। একইভাবে মেয়েরাও কখনও কখনও ছেলেদের বিরক্ত করে থাকে। ছেলে হোক, মেয়ে হোক এ ধরনের আচরণ করা কারো উচিত নয়। একে অপরের প্রতি সম্মান দেখানোই সাধারণ ভদ্রতা।

আমি আমার বন্ধুদের সাথে বাইরে বেড়াতে যেতে চাই কিন্তু আমার মা-বাবা সারাক্ষণ লেখাপড়া করার ব্যাপারে চাপ দেয় কেন?

সাধারণত মা-বাবারা তাদের ছেলে-মেয়েদের কল্যাণের ব্যাপারে চিন্তিত থাকেন এবং তাদের মঙ্গল কামনা করেন। সন্তানকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে সবার আগে প্রয়োজন তার ভালো করে শিক্ষা অর্জন। এ বয়সে তোমাদের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কম থাকে বলে অনেকেই নিজেদের ভালোমন্দ বুঝতে পারো না। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বাইরে মেলামেশা বা হৈ চৈ করতে গিয়ে কোনো ভুল হতে পারে বা তোমরা বিপদে পড়তে পারো, এমনকি বন্ধুরাও বাইরে বেড়ানোর কথা বলে বিপদে ফেলতে পারে এবং এ রকম কিছু হলে তারা হয়তো তোমাদের সাহায্য করতে পারবেন না। তাই তারা চান তোমরা লেখাপড়ায় ব্যস্ত সময় কাটাও- যাতে বাড়তি সময় পেয়ে বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে জড়িয়ে বিপদে না পড়ো।

চাচাতো ভাই বা জ্যাঠাতো ভাই এক বাসায় থাকি, কলের পাড়ে গোসল করতে গেলে তাকিয়ে থাকে এটা খারাপ লাগে। কেন এরকম করে? আমি তো শুধু বাহিরে নির্যাতন হচ্ছি না, বাসায়ও নির্যাতন হচ্ছি, কেন হচ্ছি?

কিছু কিছু পুরুষের বিকৃত মানসিকতার কারণে আমাদের দেশে অনেক মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। অনেক সময় এ ধরনের নির্যাতন বা বিকৃত মানসিকতা নিজের পরিবার বা খুব কাছের পুরুষদেরও থাকতে পারে। এই মানুষ পরিবারের মেয়েদেরও নির্যাতন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিকৃত রুচির মানুষের কাছে কোনো মেয়েই নিরাপদ নয়। এই পুরুষটি যেই হোক না কেন তার এই ধরনের আচরণের বিষয়টি মা-বাবা বা পরিবারের অন্য নির্ভরযোগ্য অভিভাবককে জানাতে হবে এবং এর কঠিন প্রতিবাদ করতে হবে।

আমার এক বান্ধবীর গায়ে তার এক শিক্ষিত আত্মীয় হাত দিয়েছিল। শিক্ষিত হয়েও সে এ কাজ কেন করলো?

অনেক মেয়েদের এমনকি ছেলেদেরও শিক্ষিত আত্মীয়রা খারাপ উদ্দেশ্যে বিরক্ত করে থাকে। এ রকম আচরণ যেমন- গায়ে হাত দেয়া হচ্ছে এক ধরনের যৌন নিপীড়ন। এ ধরনের যৌন নিপীড়ন যেকোনো জায়গায় যেমন - রাস্তাঘাটে, বাসে, কর্মক্ষেত্রে বা বাসায়ও হতে পারে। অনেক সময় নিকট আপনজন যারা বাহ্যিকভাবে ভদ্র ও শিক্ষিত তারাও যৌন নিপীড়ন করতে পারে। অল্পবয়সি মেয়েরা বা ছেলেরা এমন নিপীড়নের শিকার বেশি হয়। যারা যৌন নিপীড়ন করে তারা অনেক সময় নানা ধরনের ভয় দেখায়, যাতে এ ব্যাপারটা অন্যরা জানতে না পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা না করে অভিভাবক বা বড় যাদের সাথে সহজে কথা বলা যায়, তাদের জানানো উচিত। এটা কোনোমতেই চুপচাপ সহ্য করা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, যে যৌন নিপীড়নের শিকার হয় সে নিজে দোষী নয়। যে এটা করে সে-ই দোষী।

এটা (যৌন নিপীড়ন) কীভাবে বন্ধ করা যায়?

যৌন নিপীড়ন একটি গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সমাজের প্রতিটি মানুষ সচেতন হলে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বন্ধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে পরিবারের এবং স্কুল-কলেজের মাধ্যমে যৌন হয়রানির খারাপ দিকগুলো জানাতে ও শেখাতে হবে।

নারীদের সম্মান দেবার শিক্ষা ছোটবেলায় তার পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই একটি ছেলেকে গ্রহণ করতে হবে এবং এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে।

যৌন নির্যাতন বন্ধের জন্য মেয়েদেরও নিজেদের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে। পাশাপাশি যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের শিকার যাতে না হতে হয় সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে এবং চলাফেরায় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোনো মেয়ে যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের শিকার হলে যৌন নিপীড়নকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে এবং প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যৌন হয়রানির কারণে মেয়েরা কেন আত্মহত্যা করে?

কোনো মেয়ে যৌন হয়রানির শিকার হলে সে শুধু শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং সামাজিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের রক্ষনশীল সমাজ অনেক সময় অপরাধীদের দোষ না দিয়ে উল্টো যে মেয়েরা যৌন হয়রানির শিকার হয় তাদের ঘাড়ে দোষ চাপায়, যা অত্যন্ত ভুল ও দুঃখজনক। সমাজের চাপ ও পরিবারের সদস্যদের নিরুৎসাহের কারণে অনেক সময় মেয়েরা প্রতিবাদ, সাহায্য বা বিচার চাইতে পারে না। ফলে তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এ সময় পরিবার ও বন্ধুদের যথোপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা না পেয়ে অনেকেই নিজের জীবন ও ভবিষ্যত বিষয়ে হতাশ হয়ে নিজেকে একা ভাবে এবং আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

কিন্তু আত্মহত্যা কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ হতে পারে না। জীবন মূল্যবান, সামান্য কোনো একটি ঘটনার জন্য একে মূল্যহীন মনে করা উচিত না। জীবনে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা থাকবেই। দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। তাই আমাদের সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে যৌন হয়রানির শিকার যে মেয়েটি তাকে সাহায্য করতেই হবে, যাতে সে আবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। মনে রাখবে, আত্মহত্যা কোনো সমস্যার সমাধান নয়, বরং মহাপাপ।

ইভ টিজিং বা যৌন হয়রানির জন্য সাজার/শাস্তির কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা? যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতনের শাস্তি কি?

ইভ টিজিং/যৌন হয়রানি বন্ধ করতে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে দণ্ডবিধি ৫০৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধীকে ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিক বিচার করে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন। যৌন হয়রানি গুরুতর অপরাধ। এর জন্য আদালতেও মামলা দায়ের করা যায়। এর সাজা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৩-এর ১০ ধারা অনুযায়ী দেয়া হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এ অপরাধের বিচার করে।

সামনাসামনি ছাড়াও মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ভিডিও ইত্যাদি ব্যবহার করে কাউকে যৌন হয়রানি করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

আমাদের দেশে দণ্ডবিধি ৫০৯ ধারায় ইভটিজিং-এর শাস্তি ১ বছর কারাদণ্ড বা ২ হাজার টাকা জরিমানা। ইভটিজিং এবং যৌন হয়রানি একই পর্যায়ে পড়ে।

যৌন নিপীড়ন বা যৌন নির্যাতন গুরুতর অপরাধ। অবৈধভাবে যৌন কামনা মেটানোর উদ্দেশ্যে শরীরের অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা অঙ্গ স্পর্শ করানোকে যৌন নিপীড়ন হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী যৌন নিপীড়নকারীর ৩ থেকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হতে পারে।

ধর্ষণ একটি গুরুতর যৌন নির্যাতন। ২০০৩ সালে সংশোধিত আইন অনুযায়ী ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড। ধর্ষণের ফলে নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।

কোনো শিশু বা নারী ধর্ষিত হলে কি করা উচিত?

কোনো নারী বা শিশু যদি ধর্ষণের শিকার হয়-

- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিভাবককে অথবা নির্ভরযোগ্য কাউকে জানাতে হবে
- সময় নষ্ট না করে তখনি থানায় গিয়ে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ওসি-কে রিপোর্ট করতে হবে
- রিপোর্টের ফাইল নম্বর অবশ্যই লিখে নিতে হবে
- ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার নারীকে গোসল করানো যাবে না
- আলামত বা ধর্ষিতার পরিধেয় পোশাক না ধুয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ডাক্তারকে ঘটনাটি বিস্তারিত জানাতে হবে কোনো লজ্জা না করে
- প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সর্বোপরি নির্যাতিত মেয়েটিকে মানসিক সাহস যোগাতে হবে, সহানুভূতিশীল হতে হবে।

আকর্ষণ

বয়স বাড়ার সাথে সাথে মেয়েদের ও ছেলেদের বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়। হরমোনের পরিবর্তনের কারণে এ বয়সের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো হয় এবং ছেলে ও মেয়েরা এ বয়সে একে অপরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এ ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।

ছেলেমেয়েরা এ বয়সে কেন নিজেকে আকর্ষণীয় করতে চায়?

বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা নিজের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। অন্যের কাছে নিজেকে করে তুলতে চায় আরো আকর্ষণীয়, আরো গ্রহণযোগ্য। ছেলেরা চায় মেয়েদের আকর্ষণ করতে আর মেয়েরা ছেলেদের। ভালো কাপড় ও চুলের স্টাইলে মনোযোগ দেয়া ছাড়াও তারা অনেক ব্যাপারেই যত্নশীল হয়ে ওঠে। এ বয়সে ছেলেমেয়েদের নিজেকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

কেন ছেলেরা মেয়েদের দিকে তাকায়?

একটি মেয়ে যখন ১২-১৩ বছরে পা দেয় তখন তার শরীরের পরিবর্তন হতে থাকে এবং সেই পরিবর্তন সকলের চোখে পড়ে। এ সময় ছেলেরা এমনকি অনেক বয়স্ক লোকেরা তাদের দিকে তাকায়। এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ছেলেরা মেয়েদের দিকে তাকালেই তা খারাপ এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই এবং এতে লজ্জা পাবারও কিছু নেই। তবে কোনো কোনো ছেলে বা বয়স্ক লোকেরা মেয়েদের দিকে খারাপ চোখে তাকাতে পারে। মেয়েদের দিকে খারাপ চোখে তাকানো মোটেও ঠিক নয়।

একটা ছেলেকে নিয়ে আমি অনেক ভাবি। মাঝে মাঝে স্বপ্নেও দেখি। আগে তো এমন হতো না। এখন কেন হয়?

কাউকে নিয়ে এ রকম ভাবনা হওয়া ভালো লাগার লক্ষণ। এটা আবেগের বহিঃপ্রকাশ যা সাধারণত এ বয়সে হতে পারে। পরের পর্যায়ে এটা ভালোবাসায়ও রূপ নিতে পারে। কোনো ছেলেকে গভীরভাবে ভালোবাসার আগে তার সম্পর্কে আগেই সবকিছু জেনে নেয়া উচিত। যেমন– সে তোমাকে একইভাবে ভালোবাসে কিনা আর ভবিষ্যতে তোমাকে জীবনসঙ্গী করতে চায় কিনা ইত্যাদি বিষয়। তবে এ বয়সে এসব ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ে লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়াই সবচাইতে ভালো।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়ে পরস্পরকে এত পছন্দ করে কেন?

ছোটবেলায় মা-বাবার প্রতি সন্তানদের থাকে গভীর আকর্ষণ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটা অন্যরকম হয়ে যায়। বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের সকল পরিবর্তনের মূলে রয়েছে এক ধরনের হরমোন। এ হরমোনের প্রভাবেই ছেলে ও মেয়ে পরস্পরকে জানতে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। যেহেতু এটি একটি নতুন অনুভূতি, এই পর্যায়ে তোমাদের কেউ কেউ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারো। বন্ধুদের মধ্যে কোনো একজনকে খুব ভালো লাগতে পারে এবং তার কাছাকাছি হতে ইচ্ছে করতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করা ভালো।

প্রথম দেখাতেই কি কারো সাথে প্রেম হতে পারে? প্রেম কি?

প্রথম দেখাতেই একজনকে ভালো লেগে যেতে পারে। তবে প্রেম হতে হলে বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন। ভালোবাসা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন : মা-বাবার প্রতি, বন্ধুর প্রতি, সংগীত, ধর্ম, দেশের প্রতি ভালোবাসা অথবা রোমান্টিক প্রেম। রোমান্টিক প্রেমও বিভিন্ন ধরনের। বয়ঃসন্ধিকালে যখন তোমরা ঠিক করছো কি তোমাদের পছন্দ আর কি অপছন্দ, সে সময় এক ধরনের প্রেম হতে পারে যেটাকে বলে মুগ্ধতা। এই মুগ্ধতা ক্ষণিকের জন্য হতে পারে যা খুব দ্রুত উবে যায়। বিশ্বাস না হলেও এটা ঠিক যে, কয়েকদিন বা সপ্তাহ খানেক পর তুমি অবাক হয়ে ভাববে কেন তুমি সে ব্যক্তির প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছিলে। সত্যিকারের প্রেম হলো যখন দু'জন একে অপরকে বুঝতে পারে, একে অপরের খারাপ ও ভালো সবকিছুই মেনে নিয়ে সারাজীবনের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে পরস্পরকে কাছে পেতে চায় এবং একজন আরেকজনের দায়িত্ব নিতে চায়। এজন্য অনেক আলোচনা, সমঝোতা, সময় ও ধৈর্যের দরকার হয়। কারণ এটা দীর্ঘদিনের জন্য অঙ্গীকার ও পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন।

অপরকে কীভাবে বলবো যে, তার প্রতি আমার বিশেষ কোনো আবেগ নেই?

কেউ যদি তোমার প্রেমে পড়ে আর তুমি তার প্রতি আকর্ষণ বোধ না করো তখন ব্যাপারটা বেশ জটিল। তবে এ রকম হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এ অবস্থায় দেরি না করে সময় ও সুযোগ বুঝে তাকে জানিয়ে দেবে তোমার পক্ষে তার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। কারণ যার যার নিজের মতামত, পছন্দ-অপছন্দ থাকতেই পারে। হয়তো এতে তার কয়েকদিন কষ্ট হবে। কিছুদিন যাবার পর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এসব ক্ষেত্রে সত্যি কথাটা গোপন না রেখে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে জানিয়ে দেয়া ভালো। এ রকম সমস্যা হলে নিজে যদি সমাধান না করতে পারো, তবে বড় বা অভিজ্ঞ কারো সাহায্য নিতে পারো।

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা

কিশোর-কিশোরী বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে জানা-পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতেই পারে। এ বয়সের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আবেগ ও চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আসে। দেখাশোনা ও আলাপের কোনো এক পর্যায়ে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। কখনো কখনো এটা সাধারণ বন্ধুত্ব থেকে বেশ গভীর পর্যায়ে যেতে পারে। অনেক সময় এ ভালোলাগা শেষ পর্যায়ে প্রেম ও ভালোবাসায় রূপ নিতে পারে।

ছেলেদের সাথে ছেলেদের বন্ধুত্ব হয়। ছেলের সাথে একটা মেয়ের বন্ধুত্ব হলে এটা কি খারাপ?

ছেলে-মেয়ে বন্ধুত্বে কোনো ক্ষতি নেই। তবে আমাদের সমাজ ছেলে-ছেলে অথবা মেয়ে-মেয়ের বন্ধুত্ব যতটা সহজে গ্রহণ করে, ঠিক একইভাবে ছেলের সাথে মেয়ের বন্ধুত্বের ব্যাপারটা অনেকে সহজে মেনে নেয় না। একটি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকা দোষের কিছু নয়। তবে ছেলে ও মেয়ের বন্ধুত্ব শুধু বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ভালো। তা যেন কোনোভাবেই শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত না গড়ায়।

যদি আমার ছোটবেলার বন্ধু পরে বিশেষ বন্ধু হয়ে প্রেম করতে চায়, আর আমি যদি না চাই তবে আমি কি করবো?

অনেক সময় ছোটবেলার বন্ধুও বড় হয়ে প্রেম নিবেদন করতে পারে। দু'জনে একমত হলে এ রকম বন্ধুত্বে কোনো অসুবিধা নেই। যদি ব্যাপারটা একতরফা হয়, তবে অন্যজনকে বুঝিয়ে বলতে হবে। একবারে বুঝাতে না পারলে বারবার বুঝানোর দরকার হতে পারে। তবে এ বয়সে প্রেম করার ফলে লেখাপড়ার ক্ষতি যেন না হয় আর শারীরিক সম্পর্ক না গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অল্প বয়সে প্রেম করলে পরে কি কোনো সমস্যা হবে?

কৈশোর হলো জীবন গড়ার সময়। এ সময়ে প্রেমের সম্পর্ক ছাড়াও আরো ভালো অনেক কিছু করার আছে। তাই এ বয়সে এসব ব্যাপারে না জড়িয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়াই সবচাইতে ভালো।

প্রেম করলে কেন ছেলেমেয়েরা ধরাধরি করে?

প্রেম এমন একটি সম্পর্ক যেখানে প্রেমিক প্রেমিকা দু'জন দু'জনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, এ অনুভব হতেই তারা পরস্পরকে কাছাকাছি পেতে চায় এবং এ কারণেই অনেক সময় তারা পরস্পরকে স্পর্শ করতে চায়। আমাদের সমাজ এটা ভালো চোখে দেখে না। কৈশোর হলো জীবন গড়ার সময়। এ বয়সে প্রেমের সম্পর্ক ছাড়াও আরো অনেক কিছু করার আছে।

পরিস্থিতির চাপে যদি দৈহিক মিলনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে আমি সে অবস্থায় কি করবো?

বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা পরিস্থিতির চাপে এরকম অবস্থায় পড়তে পারে। কিছু কিছু পরিস্থিতিতে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার মতো অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। যদি কারোর মনে হয় যে তার প্রেমিক এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী তবে মেয়েটিকে এ প্রস্তাবে সায় না দিয়ে বড় কারো সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা ভালো এবং সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আবেগকে 'না' বলতে জানাটাও বড় হওয়ার একটি লক্ষণ।

২ কোনো কারণে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পেটে বাচ্চা এসে যায় আর ভয় থাকে যে, মা-বাবা মেয়েটিকে গ্রহণ করবে না, তখন সে কোথায় যাবে?

অনিচ্ছায় ও জোরপূর্বক দৈহিক মিলনের ফলে একটি মেয়ের পেটে বাচ্চা আসতে পারে। এ অবস্থায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেরি না করে উপদেশের জন্য মা-বাবা অথবা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।

ভালো লাগার পরের পর্যায়

ভালো লাগার পরের পর্যায়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আকর্ষণও সৃষ্টি হতে পারে। এ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে, যেমন- চিঠি লিখে, দেখা করে ইত্যাদি। সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌন অনুভূতিকে সংযত করে রাখার চেষ্টা করাই ভালো। আরেকটা ব্যাপার মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রেমিক-প্রেমিকার কথাবার্তা ও সম্পর্ক যেন নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেটা যেন সবার আলোচনার বিষয় না হয়।

আমি কি করে বুঝাবো যখন একটি মেয়েকে আমার ভালো লাগে?

তোমার সাথে অনেক মেয়েরই পরিচয় হতে পারে, আলাপও হতে পারে। তবে সবাইকে যে ভালো লাগবে তেমন কোনো কথা নেই। যে মেয়ের কথা তোমার প্রায়ই মনে পড়বে, যার হাসি যার কথা তোমার শুনতে ইচ্ছা করবে, যার সাথে একটু কথা বলার জন্য বা দেখা পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে– মনে করবে সেই মেয়েটিকেই তোমার ভালো লাগে। এই ভালো লাগাটা তাকে তুমি কোনো কিছু উপহার দিয়ে, মুখে বলে বা চিঠি লিখেও জানাতে পারো। তবে মেয়েটিও তোমাকে পছন্দ করছে কিনা তা জানাটা খুব জরুরি। কারণ তুমি পছন্দ করছো বলেই মেয়েটিও তোমাকে পছন্দ করছে এমনটি নাও ঘটতে পারে। এ অবস্থায় তোমার পছন্দ জোর করে মেয়েটির উপর চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। মনে রাখার ব্যাপার হচ্ছে, সকলেরই নিজস্ব মতামত আছে এবং দু'জনের দু'জনকে যদি ভালো না লাগে তবে সম্পর্ক গভীর বা স্থায়ী হয় না।

তবে তোমাদের এই বয়সে ভালোলাগার সম্পর্ক নিয়ে বেশি না ভেবে পড়াশোনা এবং অন্যান্য সৃজনশীল কাজ যেমন- খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদিতে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কারণ এ বয়সটা তোমাদের ভবিষ্যৎ গড়ার সময়।

আমার প্রেমিক যদি আমাকে জড়িয়ে ধরে সেটা কি দোষের?

যখন ছেলে-মেয়ের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন তাদের মধ্যে অনেকে কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ভয় থাকতে পারে যে, যে কোনো সময় জড়িয়ে ধরা থেকে পরের পর্যায়ে তা দৈহিক সম্পর্কে রূপ নিতে পারে। তাই জড়িয়ে না ধরাই ভালো। প্রত্যেকের শরীর তার নিজের, একে রক্ষা করে চলা তার নিজেরই দায়িত্ব। তাই এসব সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব বজায় রেখে সাবধান থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এ বয়সে ছেলেদের যৌন উত্তেজনা বেশি থাকে বলেই তারা খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। যদি বিয়ের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এ সম্ভাবনা কম থাকে। আমাদের মা-বাবারা এটা শুনতেই চায় না, তারা বলে বেশি বয়সে বিয়ে করা ভালো। কোনো ভুল করার চেয়ে বিয়ে করাটা কি ভালো না?

একটি ছেলে যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে তখন তার মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন হতে থাকে। তখন সে যৌন উত্তেজনা অনুভব করতে পারে। এটা স্বাভাবিক, কিন্তু এর সমাধান বিয়ে নয়। কারণ বিয়েটা শুধু দৈহিক সম্পর্কের জন্য নয়, বিয়ের সাথে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, সন্তান জন্মদান এবং প্রতিপালন, সংসার চালানোর জন্য অর্থ উপার্জনসহ অনেক বিষয় জড়িত। অল্প বয়সে বিয়ে করে বাচ্চা হলে তা মা ও বাচ্চা দু'জনের জন্যই ক্ষতিকর। তাই বিয়ের জন্য শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য, মানসিক পরিপক্কতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে আমাদের দেশে আইনত বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া যৌন উত্তেজনা অনুভবের বিষয়টি মানসিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ধীরে ধীরে সেটা শরীরের সাথে খাপ খেয়ে গেলে তখন আর অসুবিধা হয় না। এই বিষয়টি প্রকৃতিগতভাবেই শরীরে চলে আসে। সুতরাং এ নিয়ে অতিরিক্ত না ভেবে অন্যভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। যেমন– খেলাধুলা করা, বই পড়া, খবরের কাগজ পড়া, হাতের কাজ করার পাশাপাশি ধর্মীয় কাজে মনোযোগী হওয়া ইত্যাদি।

প্রেম করলে মেয়েদের কেন সব দোষ হয়? ছেলেদের কেউ কিছু বলে না কেন?

'প্রেম' মানব মনের একটি অনুভূতি যা কৈশোরে কিশোর-কিশোরীদের মনে জাগতে শুরু করে। এ সময় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এই বয়সে শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিক পরিবর্তনের ফলেই এমনটি ঘটে। একটি প্রেমের সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই সমান ভূমিকা রয়েছে। প্রেম করা আসলে দোষের কিছু নয়। কিন্তু আমাদের রক্ষণশীল সমাজে পরিবারের বদনাম হবার ভয় এবং মেয়েদের দুর্বল অবস্থানের কারণে মেয়েদেরকেই বেশি দোষারোপ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রেমের সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই দায়িত্ব সমান। তাই শুধু মেয়েদের দোষারোপ করা মোটেও ঠিক নয়। এটা কিন্তু শুধু আমাদের সমাজেই নয়, অনেক সমাজের জন্যই প্রযোজ্য।

যদি আমার ছেলেবন্ধু তার খালি বাড়িতে যাওয়ার জন্য বলে, তবে আমি কি যাব?
প্রেম করলে ছেলেরা একা একা দেখা করতে চায় এবং কাছে এসে বসতে চায়। কেন?

এ রকম অবস্থায় পড়লে একটি মেয়েকে তার বিচার-বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে। একটি ছেলে যদি একটি মেয়েকে তার খালি বাড়িতে যাওয়ার জন্য বলে তবে মেয়েটির তার সাথে না যাওয়াই ভালো। এর পরিণতি কি হতে পারে তা বিবেচনা করা উচিৎ। একা এসব স্থানে গেলে তুমি বিরাট ঝুঁকিতে পড়তে পারো, যেমন- তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দৈহিক মিলনেও জড়িয়ে পড়তে পারো, যার পরিণতি কখনোই ভালো নয়। মনে রেখো, এ রকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় বিষয় হলো একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দু'জন দু'জনের মতামতকে সঠিক গুরুত্ব ও সম্মান দেয়া।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বয়ঃসন্ধিকালে অনেক ব্যাপারেই নিজেকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যার কয়েকটা ছোট আর কয়েকটা বেশ বড়। যেমন: পছন্দমতো কাপড় পরা, সঙ্গী নির্বাচন, পড়াশুনার বিষয় ঠিক করা ও কোনো কোনো সময় নিজের বিয়ের ব্যাপারটাও। নিজের স্বপ্নকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হলে প্রতিটি ব্যাপারেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এটা সহজেই সম্ভব যদি সবকিছু বড়দের সাথে আলোচনা করে নেয়া যায়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কেন জরুরি?

আমরা সবসময় কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করি। কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা অনুসরণ করলে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা অনেক সহজ হয়। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে সবারই প্রয়োজন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা ও সে অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া। এ বয়সে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য ভালো কাজ করে যেতে হবে। এভাবেই তোমাদের জীবনে আসবে সফলতা।

আমি কি করে বুঝবো, আমার চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা ঠিক কিনা?

তুমি জীবনে কি হতে চাও বা কি করতে চাও তা তোমাকেই চিন্তা করে বের করতে হবে। এরপর এ ব্যাপারে মা-বাবা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য বা বন্ধু-বান্ধব যাদের প্রতি তোমার আস্থা আছে তাদের পরামর্শ নিতে পারো। কোনো সমস্যা হলে বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলে মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আপনজন বা অভিজ্ঞ কারো সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারো।

একজন মেয়ে হয়ে মা-বাবাকে কীভাবে বুঝাবো আমি দেরিতে বিয়ে করতে চাই?

তোমার মা-বাবার সাথে এ ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খোলামেলা আলোচনা করবে। তুমি যদি কাউকে কিছু না বলো, তাহলে তোমার মনের কথা কেউই জানতে পারবে না। আরো ভালো হয় যদি পরিবারের কাউকে বিশ্বাস করে তোমার মনের কথাগুলো বলতে পারো। যারা পড়াশুনা করছো তারা যদি তা শেষ করতে পারো তবেই তোমার পক্ষে কিছু যুক্তি থাকবে। বিয়ের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হতে পারবে এবং নিজ পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হতে পারবে। তুমি এটাও বলতে পারো যে, অল্পবয়সে বিয়ে করলে তোমার ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে ঠিক বয়সে বিয়ে করলে তোমার স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সাথে তোমার সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে, তুমি ভালোভাবে তোমার পরিবারের যত্ন নিতে পারবে, ঠিক সময়ে সন্তান নিতে পারবে। এছাড়াও তোমার কোনো চাকরি অথবা ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হবার সুযোগ থাকবে।

ছেলেরা কেন দেরি করে বিয়ে করে?

আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় একটি ছেলেকেই সাধারণত পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হয় এবং বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্বও স্বামীকে নিতে হয়। এসব কারণে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছেলেদের বিয়ে করতে দেরি হয়। আর আইনেও মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি বয়সে বিয়ের নিয়ম রয়েছে।

একজন আদর্শ জীবনসঙ্গীর কি কি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন? ভালো পাত্র কীভাবে নির্বাচন করবো?

এটা নির্ভর করবে ব্যক্তি, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং প্রয়োজনের উপর। জীবনসঙ্গীর কাছে তুমি কি চাও, সে ব্যাপারে চিন্তা করো এবং এটা পরিবারের কারো সাথে আলাপ করো। একটি সম্পর্ক নিয়ে অনেক কিছুই কল্পনা করা যেতে পারে- এটা মনে হতে পারে যে, সবকিছুই ঠিকঠাক মত চলবে। অনেক মেয়েরা নিজের বিয়ের ব্যাপারে তেমন চিন্তা করে না, কিন্তু অন্যদেরকে নানাবিধ পরামর্শ দিয়ে থাকে। কোনো কোনো মেয়ের নিজের বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা করার ব্যাপারটা নতুন কিছু মনে হতে পারে। জীবনসঙ্গী খোঁজার সময় অনেক কিছুই মনে রাখতে হবে। এমন নয় যে শুধু তুমিই পরিবারের সবাইকে সুখী করবে, এমন একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী বেছে নিতে হবে যে তোমাকেও সুখী করবে। তোমাদের দু'জনকেই একে অপরকে বুঝতে হবে, সম্মান করতে হবে ও সাহায্য করতে হবে।

মেয়েদের মতো ছেলেদের বেলায়ও আগেই চিন্তাভাবনা করে সঙ্গী নির্বাচন করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত গুণাবলীর সাথে পারিবারিক অবস্থাও বিবেচনায় রাখলে বিয়ের পর তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। মনে রাখা প্রয়োজন, দু'টি মানুষ কখনই একরকম হতে পারে না। একে অপরের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়াটাই জীবনের বড় কথা।

মা-বাবা ঠিক করলেই কেন বিয়ে করতে হবে?

বিয়ে একটি পবিত্র সম্পর্ক যা সাধারণত শুধু একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মাঝেই হয় না, বরং দু'টি পরিবারের জন্য এটি একটি বন্ধনস্বরূপ। তাই প্রত্যেক মা-বাবাই চান তার ছেলে বা মেয়েকে দেখেশুনে ভালো মেয়ে বা ছেলের সাথে বিয়ে দিতে। তবে কোনো কোনো সময় সবদিক বিবেচনা করে এবং বাবা-মাকে রাজি করিয়ে নিজেদের পছন্দের পাত্র বা পাত্রীকে বিয়ে করতে কোনো ক্ষতি নেই।

কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করা ভালো, না মা-বাবার ঠিক করে দেয়া স্থানে বিয়ে করা ভালো? প্রেম করলে মা-বাবা বিয়ে দিতে চায় না। কেন?

ভালোবেসে বিয়ে করা অনেক সময় আমাদের বাবা-মা বা পরিবার মেনে নিতে চায় না। কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর পরিণতি খারাপ হতে দেখা যায়। তখন হয়তো দু'পক্ষকেই আবার মা-বাবার সাহায্য চাইতে হয়। তাই মা-বাবার মত নিয়েই বিয়ে করা ভালো। তা ছাড়া মা-বাবার যেহেতু জীবন সম্বন্ধে ধারণা আরও গভীর এবং তোমার ভালোমন্দ তাদের চেয়ে আর কেউ ভালো বুঝেন না, তাই সাধারণত তাদের সিদ্ধান্তটিই সঠিক হয়ে থাকে। তবে পছন্দ থাকলে দুই পক্ষের মা-বাবা, মুরব্বিদের সাথে কথা বলে নিজের যুক্তিটা বুঝিয়ে বলতে হবে। মা-বাবার ঠিক করা পাত্র বা পাত্রী কোনো কারণে পছন্দ না হলে সেটা তাদের খোলাখুলিভাবে আগেই জানানো ভালো।

একজন ছেলে বা মেয়ে যদি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের আগেই সংসারী হয়, এটা কি তার জন্য খারাপ?

লেখাপড়া শেষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর বিয়ে করা ভালো। এতে সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। তবে যদি নিজের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে ও বিয়েটা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে বাধা না দেয়, সে ক্ষেত্রে বিয়ে করাটা তেমন ভুল নয়। মেয়েদের ব্যাপারেও লেখাপড়া শেষ করেই বিয়ে করা ভালো। যারা লেখাপড়া করে না, সেসব ছেলে-মেয়েদেরও কম বয়সে বিয়ে না করা ভালো। বরং বিয়ের আগ পর্যন্ত স্কুলের বাইরে হলেও লেখাপড়া করা বা কোনো বিষয়ে কাজের প্রশিক্ষণ নেয়াটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সঠিক বয়সে ও উপার্জনক্ষম হয়ে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে অসুবিধা হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। কারণ বিয়ে মানেই নিজের ও সংসারের সব দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়া ।

তথ্য ও সেবা পাওয়ার স্থান

আরও বেশি তথ্য জানতে ও স্বাস্থ্যসেবা পেতে যার/যাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, বইটি পড়ার পরও যদি তোমার আরও কিছু জানার থাকে তাহলে এমন কাউকে খুঁজে বের করো, যার উপর তোমার বিশ্বাস আছে এবং যার কাছ থেকে তুমি অনেক কিছু জানতে পারো। তিনি হতে পারেন তোমার বড় বোন, বড় ভাই, পরিবারের অন্য সদস্য, বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু অথবা তোমার এলাকার ক্লিনিকের একজন স্বাস্থ্যকর্মী। এভাবে তুমি কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে যা যা জানার তা জানতে পারবে।

এই বইয়ে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সে সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা বা পরামর্শের দরকার হলে তুমি নিম্নলিখিত স্থানে যোগাযোগ করতে পারো:

- সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র
  - কমিউনিটি ক্লিনিক
  - ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
  - উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
  - মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
  - জেলা সদর হাসপাতাল
  - সকল মেডিকেল কলেজে অবস্থিত মডেল ক্লিনিক
  - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ক্লিনিক
  - মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা
  - আজিমপুর এমসিএইচটিআই, ঢাকা
- দেশের বিভিন্ন এনজিও ক্লিনিক
- সূর্যের হাসি চিহ্নিত ক্লিনিক
- শহর এলাকায় রংধনু ক্লিনিক
- ব্র্যাক সুস্বাস্থ্য ক্লিনিক
- মেরী স্টোপস্ ক্লিনিক
- এসএমসি সুরক্ষা কেন্দ্র
- গ্রামাঞ্চলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভালো ডিপোহোল্ডার ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং
- এসএমসির টেলি জিজ্ঞাসা।

ফোন : ০৯৬১২০১২৩৪৫, ০৯৬১২০০০১১১

হট লাইন : ১৬৩৮৭

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সেবাকেন্দ্রে গিয়ে এমন কাউকে খুঁজে নেয়া যার কাছে প্রশ্ন করতে বা সেবা নিতে তুমি স্বস্তি বোধ করো।

মনে রেখো, এই সবই তোমার ভালোর জন্য। তাই তোমাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন হলে তোমাকে তাদের কাছে গিয়ে দেখা করতে হবে।

USAID

NGO Logo

ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের
আইইসি টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদনক্রমে বিসিসিপি কর্তৃক প্রণীত
এখানে প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে ইউএসএআইডি'র মতের মিল না-ও থাকতে পারে।

ISBN # 984-757-072-3